জ্বীনদের পরিচয়

আহমদিয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.) বিভিন্ন সময়ে জাতি, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সব লোকদেরকে তার কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও বিষয়াদি উত্থাপনের সুযোগ দিতেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে লন্ডনে আরবী ভাষাভাষী লোকদের জন্য আয়োজিত তেমনি এক প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানের একটি প্রশ্নের উত্তর মাসিক *রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স* পত্রিকার জানুয়ারি ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনুলিখন করেছিলেন আমাতুল হাদি আহমদ। বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার্থে এটির বঙ্গানুবাদ এখন ছাপানো হচ্ছে। অনুবাদ করেছেন **-মহিউদ্দিন অভি**।

প্রশ্নঃ আমরা যদি ধরে নিই জ্বীন অন্যান্য প্রাণির মতোই একটি সৃষ্টি; যা কিনা পৃথিবীর কোনো এক স্থানে ভিন্ন কোনো মাত্রায় [ডাইমেনশনে] অবস্থান করে। তাহলে তো কোনো সমস্যাই থাকে না?

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ঃ

কোন সমস্যা তো নেই এবং জ্বীন কোন সমস্যা তৈরী করে না। সমস্যা হচ্ছে কেবল সেসকল লোকদের মনের মধ্যে যারা আন্যদের এটা বিশ্বাস করাতে পছন্দ করে যে তাদের 'জ্বীন' নামক কিছু প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা পরে 'জ্বীন' তাড়ানো ইত্যাদির নাম করে লোকদের কাছ থেকে অর্থ কামানোর পায়তারা করে। এ জায়গাতেই সমস্যা, তা না হলে 'জ্বীন' এমন সত্তা যারা মানুষের জীবনে বাগড়া দেয় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা কেউ উত্থাপন করে না অথচ এর উত্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে যা শরীয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে তা হলো 'জ্বীন'রা নবী-রাসূলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কতখানি বাধ্য বা আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট। যদি 'জ্বীন'দেরকে কোন এক প্রকারের পৃথক প্রাণী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যদি তাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, তাহলে শরীয়া বা ধর্মীয় নীতিমালা অনুসারে তাদের কি অবস্থা হবে? যদি 'জ্বীন'দেরকে প্রকৃতিগতভাবে উদাহরণস্বরূপ ফেরেশ্‌তাদের অনুরূপ অশরীরী কোন সত্তা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এই বিষয়টি অনেক পরিস্কার হয়ে যায়। আমরা অবশ্য জানিনা ফেরেশ্‌তারা দেখতে কী রকম। কিন্তু আমরা এটা জানি যে তারা রূপ ধারন করতে পারে এবং বিভিন্ন রূপে বিকশিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ফেরেশ্‌তাকে কখনো কখনো কবুতরের আকৃতিতে দেখা যেতে পারে যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) দেখেছিলেন। হযরত রাসূল পাক (সা.) হযরত জীবরাঈল (আ.)-কে এক সময় এমন এক অস্তিত্ব হিসেবে দেখেছিলেন যা সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ছিল আর তাঁকে এক সময় মানুষের রূপে দেখেছিলেন। এ থেকে এটা বুঝা যায় যে ফেরেশ্‌তাদের আমাদের মতো কোন শারিরীক আকৃতি বা অস্তিত্ব নেই। যদিও, তাদেরকে দৃশ্যমান হতে হলে কোন এক আকৃতি ধারণ করতে হয়। পবিত্র কুরআনে এরকম একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে উল্লেখ করে :

.....এবং সে তার সামনে এক সুস্থসবল মানুষের আকার ধারণ করলো। (সূরা মরিয়ম ১৯ : ১৮)

অর্থাৎ, যে ফেরেশ্‌তা হযরত মরিয়মের নিকট আবির্ভূত হলো সেটা তার নিজস্ব রূপ ছিল না-এটা ছিল এক সুগঠিত, সুদর্শন পুরুষ যাকে হযরত মরিয়ম দেখেছিলেন কিন্তু এটা কোন মানুষ ছিল না-এটা ছিল আল্লাহ্‌র এক ফেরেশ্‌তা। এভাবে, ফেরেশ্‌তাদেরকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হয় যখন তারা মানুষের সামনে আসে এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কাছে আসা আল্লাহ্ তাআলার দূতদের সাধারণ মানুষ হিসেবে ভুল বুঝেছিলেন। তারা দেখতে এতখানি মানুষের মত ছিল যে হযরত ইবরাহীম (আ.) মেহমানদের জন্য একটি ছাগলছানা রান্না করার আদেশ দিয়েছিলেন। বিষয়টি হচ্ছে যে হযরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর মেহমানদের প্রকৃত রূপ চিনতে ভুল করেছিলেন। আমি এখানে এটা বলতে চাচ্ছি না যে 'জ্বীন'রা ফেরেশ্‌তাদের অনুরূপ কোন অস্তিত্বের অধিকারী। যদিও, যতদূর জ্বীনরা কোন অশরীরী সত্তা ধারন করতে পারে, সেখানে এই দুইয়ের মাঝে প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। যেহেতু জ্বীনরা কোন বস্তুগত আকৃতি ধারণ করে না, তারা ফেরেশ্‌তাদের মতো কোন ছায়ারূপে আবির্ভূত হতে পারে এবং এরূপ তারা বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'জ্বীন' মুকাল্লাফ বিশারিয়া কিনা? অর্থাৎ, তারা কি ধর্মীয় নিয়মের অধীনে পড়ে কিনা? তাদের কি কোন একটি শরীয়া বা ধর্মীয় আইন গ্রহণ করতে হবে কিনা? কে সেই দাঈ-ইলাল্লাহ্ যে তাদের আল্লাহ্‌র দিকে ডাক দেয় এবং কিভাবে সেই বাণী তাদের নিকট পৌঁছায়? এটা কি বাতাসে 'ছড়িয়ে-ছিটিয়ে' থাকে যাতে করে 'জ্বীন' নামায এবং হজ্জ পালন করে? তারা কিভাবে যাকাত প্রদান করে? তারা কিভাবে বিয়ে করে এবং তাদের উত্তরাধিকারকে ছড়ায়? এ সব বিষয়ই শরীয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

একমাত্র যখন এসব বিষয় সামনে আসে, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে যদি 'জ্বীন'কে কোন অশরীরী অস্তিত্ব হিসেবে ধরা হয় তাহলে এটা হতে পারে না যে কোন মানুষ নবীকে মান্য করা তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক আবশ্যকীয় করা হবে। এটা এজন্য যে একজন নবীকে হতে হবে তার নিজ প্রজাতির মধ্য হতে। ফেরেশ্‌তাদের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন এই ধারণা বর্জন করে যে যখন মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয় তখন একজন ফেরেশ্‌তার নবী হিসেবে অবতরণ করা উচিত। তখন কিভাবে একজন মানুষ নবীকে কোন অশরীরী অস্তিত্বের কাছে প্রেরণ করা যাবে, যদি আমরা 'জ্বীন'কে সেরকম ধরে নেই? তাই যদি না হয়ে থাকে তবে কি কোন 'জ্বীন' নবী আছে? কিভাবে আল্লাহ্‌র বাণী তাদের নিকট ওহী হয়েছিল? আমরা কুরআন শরীফের কোথায় এটা পাই না যে আল্লাহ্ তাআলা কোন 'জ্বীন' এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন। আমরা দেখি যে আল্লাহ্ তাআলা এমনকি মৌমাছির নিকট ওহী করেন কিন্তু আমরা 'জ্বীন' সম্পর্কে এমন কিছুর উল্লেখ পবিত্র কুরআনে বা হাদীসে দেখতে পাই না।

যুক্তি-তর্কের এই ধারা একটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে মিটিয়ে ফেলে এবং তা হচ্ছে কুরআন শরীফে যে 'জ্বীন'-এর উল্লেখ আছে যারা রাসূলে পাক (সা.)-কে গ্রহণ করেছিল তারা অশরীরী ধরনের 'জ্বীন' ছিল না, তারা এক ভিন্ন ধরণের সৃষ্টি হলে কোন ভাবেই একজন (মানুষ) নবী বা কোন শরীয়াকে অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ আদিষ্ট করবেন না। তাদের কোন শারিরীক রূপ নেই যার মাধ্যমে মানুষের নিকট মানবজাতির উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনে প্রেরিত শরীয়াকে অনুসরণে তারা সক্ষম হবে। যদি 'জ্বীন' ভিন্ন ধরনের কোন সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তাদের শরীয়াও ভিন্ন হওয়া উচিত অন্যথায় কুরআন শরীফে যত নিয়ম কানুন উল্লেখিত আছে সেগুলো অশরীরী 'জ্বীন'-এর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এদের মাঝে আছে গোপনীয়তা, 'আসসালামু আলাইকুম'-এর মাধ্যমে এ মৌখিক সম্ভাষণ বিনিময়, বিয়ে, তালাক এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন, গুটি কয়েকের নাম নেওয়া হল মাত্র। তাই, যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন তা হলো এই শরীয়া কি 'জ্বীন'দের জন্য প্রযোজ্য? যারা এই বিষয়ে গতানুগতিক ধারণা রাখে তারা তাদের বিশ্বাসের প্রয়োগকে বিভিন্ন অবস্থায় বিস্তৃত করার চেষ্টা করে না (তাহলে তারা স্পষ্ট অসংগতি অনুধাবন করতে পারত)।

আর অন্যান্য বিষয়বস্তু ছাড়াও আমি এটাকে অস্বীকার করি না যে কিছু অশরীরী সৃষ্টি থাকতে পারে যাদের নিজস্ব কাজ এবং উদ্দেশ্য রয়েছে।

তবে বাকী রইল তাদের বিষয়, এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যে সকল 'জ্বীন' রাসূলে পাক (সা.)-এর কাছে এসেছিল ও মুসলমান হয়েছিল, তারা পাহাড়ী গোত্রের লোক ছিল এবং তারা লোক সম্মুখে আসতে চায়নি। তারা লোকদের কাছে দেখা দিতে চায় নি এবং এজন্যই তারা রাসূলে পাক (সা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য রাতের সময়টাতে বেছে নিয়েছিল।

[আমাদের দেশেও কোন কোন পাহাড়ী উপজাতি রয়েছে, যারা সভ্য লোকদের লোকালয়ে আসাটা পছন্দ করে না। (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, পাক্ষীক আহমদী)]

লোকদের আনাগোনা হওয়ার আগেই চলে গিয়েছিল। তারা অবশ্যই মুকাল্লাফ বিশরীয়া ছিল অর্থাৎ তারা রাসূলে পাক (সা.)-এর আনীত বাণী গ্রহণের বা অর্জনের জন্য জবাবদিহী ছিল। যখন কোন নবী প্রেরিত হয় তাকে গ্রহণ করা তাদের জন্য জরুরী ও আবশ্যকীয় ছিল। তাই, তাদেরকে মানুষই হতে হবে।

'জ্বীন' শব্দটি মহাপুরুষ, আত্মগোপনকারী মানুষ রূক্ষ ও বিদ্রোহী গোত্রের লোক, পাহাড়ী মানুষদের জন্যও প্রযোজ্য এই সমস্ত ধরনের লোকদেরকে 'জ্বীন' বলে আখ্যায়িত করা যায়।

সংক্ষেপে, আমার দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অস্তিত্বের পৃথকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব, যেটা দেবদূত প্রতিম, না মানবীয় এবং এদেরকে 'জ্বীন' বলে আখ্যায়িত করা যায়। যাই হোক, কোন পবিত্র পুস্তকে এমন কোন সাক্ষ প্রমাণ নেই যে তাদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করা হয়েছে অথবা কোন মানুষ নবীকে ঐ 'জ্বীন'-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের বাণী পৌঁছানোর জন্য। কাজেই, শরীয়া তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : *'হে জ্বীন ও মানুষের দল! তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মাঝ থেকে এমন সব রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং তোমাদেরকে এ দিনের মুখোমুখি হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো?' তারা বলবে আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' আর পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই এ কথার সাক্ষ্য দিবে, তারা নিশ্চয় কাফির ছিল।'*

(সূরা আনআম :১৩১)

যদিও এই আয়াতে মানুষের পাশাপাশি 'জ্বীন'দের উল্লেখ আছে, সৈয়দ হিলমি আল-শাফ্‌ঈ সাহেবের [সেশনের মিশরীয় সহ উপস্থাপক] প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাই যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তার পিছনে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন যে এই আয়াত প্রকৃতপক্ষে এটার প্রমাণ যে, যে 'জ্বীন'দেরকে এখানে আহ্বান জানানো হয়েছে তারা মানুষ–তারা মানুষ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। কারণ কুরআন শরীফে এমন কোন দলিল নেই যে 'জ্বীন' এবং 'বাশার' (মানুষ)-এর জন্য পৃথক পৃথক নবী পাঠানো হয়। কুরআন শরীফে এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যে বিচার দিবসের দিনে 'জ্বীন' এবং বাশারকে পৃথকভাবে প্রশ্ন করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে আহ্বান ইয়া মাআশারাল জ্বীন (হে জ্বীনদের দল) এক ধরনের বা এক অংশের লোকদের করা হয়েছে–কিন্তু তারা মানুষই।

এটা আমাকে কুরআন শরীফের অনুরূপ কিছু আয়াত মনে করিয়ে দিল যেখানে যেসকল লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কোন অশরীরী অস্তিত্ব না, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষই। আমি কুরআন শরীফ থেকে আর একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা সূরা আর রাহমান থেকে নেয়া এই আয়াত একই ভাবে শুরু হয়েছে : *'হে জ্বীন ও ইসানের দল! আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না।'*

অতএব, (হে জ্বীন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

এখানে 'ইয়া মাশারাল জ্বীন-ঈ-ওয়াল ইন্‌স' (অর্থাৎ, হে জ্বীন ও মানুষের দল!) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এই বিবৃতির অর্থ উপরে উদ্ধৃত উভয় আয়াতের জন্য এক। কুরআনের প্রয়োগ বিধি অনুসারে 'জ্বীন' শব্দটির অর্থ 'বুর্জোয়াশ্রেণী', 'সাম্রাজ্যবাদী' ক্ষমতা ও প্রভাবশালী লোক, প্রতিপত্তিশালী জাতিসমূহ বলে প্রমাণ করা যায় আর এর বিপরীতে 'ইনস' শব্দটির অর্থ 'প্রলেতারিয়াত শ্রেণী', সাধারণ লোক, জনগণ, 'সমাজতান্ত্রিক' জাতিসমূহ বলে ধরে নেওয়া যায় এবং এই দুইটি দলেরই দলনেতা রয়েছে। এই শতাব্দীতে যখন পৃথিবী 'সাম্রাজ্যবাদী' এবং গণ আন্দোলনের দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন উভয় দলেরই তাদের নেতা আছে যারা তাদেরকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে যেমন ক্ষমতাশীল ও প্রভাবশালী লোকদের নেতাদের প্রতি করা হয়েছে তেমনি সাধারণ লোকদের নেতাদের প্রতিও করা হয়েছে–যেমন ধনী জাতিসমূহের নেতাদের প্রতি করা হয়েছে তেমনি দরিদ্র জাতিসমূহের নেতাদের প্রতি করা হয়েছে। কুরআন শরীফে এই আয়াতের (সূরা ৬, আয়াত ১৩১) মাধ্যমে এই দুই দলকেই স্মরণ করা হয়েছে যে তোমাদের সকলের প্রতি নবী প্রেরণ করা হয়েছে, তোমরা যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হও না কেন। আমি বিশ্বাস করি এই ব্যাখ্যা কেবল প্রযোজ্যই নয়, এই প্রেক্ষাপটে এটাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।

এখন আমি উরোল্লিখিত অন্য আয়াতের (সূরা ৫৫, আয়াত ৫৪) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা এখানে যথেষ্ট পরিষ্কার যে 'ইয়া মাশারাল জ্বীন এবং ইয়া মাশারাল ইন্‌স' মানবজাতির দু'টি দলের প্রতি ইঙ্গিত করে কারণ এখানে এটা বেশ পরিষ্কার যে এখানে এমন সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে যখন মহাকাশ ও মহাশূন্যে সীমারেখার বাইরে যাওয়ার এবং অতিক্রম করার চিন্তা করা মানবজাতির পক্ষে সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পদক্ষেপ মানবজাতির জন্য অসম্ভব হয়ে ছিল কুআনের এই চ্যালেঞ্জ অর্থহীন ছিল। সেজন্য, এটা ভবিষ্যতের জন্য এক চ্যালেঞ্জ ছিল। 'জ্বীন'দের সম্পর্কে এটা বলা সম্ভব হয়ে ছিল যে (যদি তাদেরকে কোন অপ্রাকৃতিক সৃষ্টি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়) তারা সম্ভবত লাফ দিতে এবং নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করতে পারত কিন্তু খুব সম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছানো মানবজাতির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মানবজাতির পুরানো প্রজন্মের কাছে কি ছিল যা তারা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারত? তাদের এই উদ্দেশ্যের জন্য কিছু ছিল না। প্রমাণ উড়োজাহাজ সে সময় ছিল না। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কুরআন এই চ্যালেঞ্জ পেশ করে যে যদি মানবজাতি সমগ্র মহাবিশ্বের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে, আকতারিস-সামাওয়াত-এ-ওয়াল আর্দ, তো সে এটার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সে খুব নিশ্চিতভাবে এই প্রচেষ্টায় বিফল হবে। এটা এইরূপ হবে কারণ যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে: *'তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরণ করা হইবে, তখন তোমরা (উহা হইতে বাঁচার জন্য) একে অপরের সাহায্য করিতে পারিবে না।'* (সূরা ৫৫, আয়াত ৩৬)

অর্থাৎ, যদি তোমরা মহাবিশ্বের সীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতে তাহলে আগুনের গোলা তোমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হত এবং তোমরা বাঁধা অতিক্রম করতে পারবে না।

এই দৃশ্যপট ভবিষ্যতের কোন এক যুগের দিকে ইঙ্গিত করে, এমন এক যুগের দিকে যখন মানবজাতি দু'টি প্রধান দলে বিভক্ত হবে, ক্ষমতা ও প্রভাববাদী লোক এবং জনগণের লোক–'প্রলেতারিয়াত' গোষ্ঠী এবং 'বুর্জোয়াগোত্রী' বা 'সমাজবাদী' এবং 'সাম্রাজ্যবাদী'। উভয় ধরণের দলই চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে এবং আরও দূরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তারা মহাবিশ্বের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে–এটাই ভবিষ্যদ্বাণী। কুরআন শরীফ 'আকতারুল আর্দ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করেনি, যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর সীমারেখা কারণ এটা পৃথিবীর চারপাশের আকাশ খুব সীমিত ও ছোট জায়গা। অপরপক্ষে, পবিত কুরআনের চ্যালেঞ্জ পুরো বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কুরআন শরীফ উল্লেখ করেছে যে চূড়ান্ত পরিধি যা মহাবিশ্বের বাইরের সীমারেখা অতিক্রম করা মানবজাতির জন্য অসম্ভব। যে সময় পবিত্র

কুরআন প্রথম নাযেল হয়েছিল তখন না 'জ্বীন' না 'ইনস্' [সাধারণ লোক] এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা এই আয়াতের সত্যিকারের তাৎপর্য বুঝতে এবং সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি কারণ এখন আমরা জানি মহাবিশ্বের প্রান্তে পৌছানোর জন্য আলোর গতিতে চললে মানুষের আঠারো থেকে বিশ বিলিয়ন বছরের মত সময় লেগে যাবে - [আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬ হাজার মাইল হবে –অনুবাদক]। সমস্যাটা আরো জটিলতর হয়ে উঠে যখন আমরা মহাবিশ্বের এক চির সম্প্রসারণশীল বিশ্ব হিসেবে গণনা করি। এই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন যে মহাবিশ্বকে ক্রমাগত বিস্তৃত করা হচ্ছে এবং ঠিক এটাই বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে বলছেন, যে এটা একটি সম্প্রসারণশীল বিশ্ব। এটাই এই আয়াতের অর্থ (সূরা ৫৫, আয়াত ৩৪)। আসলে এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী, একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, আসন্ন সময়, কৃত আবিষ্কার এবং মানুষের মাঝে সৃষ্টতব্য উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে। এমন একটি সময়ে মানজাতি বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা করবে এবং আল্লাহ্ উল্লেখ করে রেখেছেন যে তারা তাদের এই লক্ষ্যে সফল হবে না। এরূপ করা তাদের জন্য অসম্ভব হবে।

সংক্ষেপে এটা কল্পকাহিনীর সেই 'জ্বীন' নয় যার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে (এটা যেভাবে উপরে উল্লেখিত হয়েছে, মহা প্রভাব এবং কতৃত্বের অধিকারী লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)। আমরা এটা তথ্য প্রমাণ থেকে জানি তাহলে আমরা কেন আমাদের চোখের সামনে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিপরীতে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা করতে যাবো। এটা একটা সত্য ব্যাপার যে, 'প্রলতারিয়াত শ্রেণী' এবং 'বুর্জোয়াগোত্র', সাম্যবাদী ব্লক এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতি, উভয় দলই মহাশূন্যে পৌছানোর জন্য চেষ্টা করেছে।

জ্বীন শব্দটি এমন একটি ব্যাখ্যা যা প্রশস্ততর উপলব্ধিকে ধারণ করে এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অস্বীকার করে না, এরূপ ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমরা পবিত্র কুরআনের প্রতি অনেক বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে সক্ষম হই।

আমি এই প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করেছি যাতে করে সেসকল লোকদের উপদেশ দিতে পারি যারা 'জ্বীন'কে অতি প্রাকৃতিক সৃষ্টি হিসেবে বিশ্বাসের ব্যাপারে খুব বেশী জোর দেয়। এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কুরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা করা এবং এরূপে করা যেন তা মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে বৈপরিত্য সৃষ্টি না করে। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ আবিষ্কার কুরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। আমি আমার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি যা থেকে এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রমাণস্বরূপ এই একটি আয়াতই উদ্ধৃত করা যথেষ্ট হতে পারে।

যারা জোর দেয় যে 'জ্বীন' শব্দটি কেবলমাত্র এমন সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য যারা মেয়েদেরকে 'বশ' করে বা কারো মুরগী ধরে নিয়ে যায়, অথবা এমন কিছু যার সাহায্যে জাদুটোনার মাধ্যমে অন্য লোকের ভালবাসা অর্জন করতে ব্যবহার করা যায়, এ ধরণের লোকদের আমাদেরকে বলা উচিত কুরআন শরীফে কি এ সকল জিনিসের উল্লেখ রয়েছে এবং থাকলে কোথায়? উপরন্তু এরকম 'জ্বীন' যদি উদ্যোগ নিয়ে থাকে (মহাবিশ্বের পরিধি পার হওয়ার), তা আমরা কিভাবে জানি? কোন প্রকারেই পুরনো যুগের মানুষেরা এরূপ চেষ্টা করতে পারে না, কিন্তু যদি এই ধরণের 'জ্বীন'ও উদ্যোগ নিয়ে থাকে, আমরা তার সম্পর্কে জানি না। তাহলে কুরআন শরীফের সত্যতার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? অপরপক্ষে, আমার ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের সত্যতার পক্ষে একটি পরিষ্কার যুক্তি উপস্থিত করে।